বাংলাদেশে কমপিউটারায়ন – এক

ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারে বাজার যাচাই করা উচিৎ। আমরা তথ্য অনুসন্ধান কমিটি পাঠাবার চেষ্টা করেছিলাম কয়েক বছর আগেই। কিন্তু তা হয়নি। বিশেষ করে হংকং, শ্রীলংকা, দক্ষিণ কোরিয়া, মালেশিয়া ছাড়াও অন্যান্য দেশ কিভাবে বাজার সৃষ্টি করেছে সেটার জন্য।

আবদুল মতিন পাটোয়ারী
সভাপতি
বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটি

১৯৫৯ সালে আমেরিকায় আমি যখন কমপিউটারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি, তখন থেকেই উৎকণ্ঠিত এবং আশাবাদী হয়ে থাকি, কবে দেশমাতৃকাকে এই আধুনিক প্রযুক্তির সুফল দিতে পারবো। অবশেষে আশার আলো জ্বালিয়ে, আমাদের অনেকদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে, বহু প্রতীক্ষিত "সোনার হরিণ" ধরা দিল। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৪ সালে আনবিক শক্তি কেন্দ্রে IBM 1620 সিরিজ-এর কমপিউটারটি আনা হলো। বাংলাদেশে প্রথম এই আধুনিক যন্ত্রটির আবির্ভাবে যে উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার বয়ে যায় সে স্রোতের টানেই উচ্চতর প্রশিক্ষণের ট্রেনিং প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়। বর্তমানের তুলনায় কম শক্তিসম্পন্ন এই যন্ত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক, সরকারী বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়। কালের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ক্রমশ কমপিউটার আদমজী, ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনত্র এলো, জয় করলো নিজ সুদৃঢ় স্থান।

১৯৬৭ সালে আমি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও তড়িৎ কৌশল বিভাগে কমপিউটার আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করি। দীর্ঘ দশ বছর চেষ্টার পর 'সোনার হরিণ'টি আমাদের হাতে আসে ১৯৭৭ সালে। IBM 370 সিরিজ-এর এই কমপিউটার আসার পর আমরা আর পেছনে ফিরিনি। নিজস্ব শিক্ষক ট্রেনিং, ডাটা এন্ট্রি, ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের সাথে সাথে যারাই আমাদের সহযোগীতা চেয়েছেন, অবসর সময়ে তাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছি কমপিউটারটি। সহযোগীতার দ্বার বিশেষ করে খোলা ছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য, যাদেরকে আমরা গবেষণা বিশেষ করে পি এইচ ডি রিসার্চের জন্য কমপিউটার সম্পূর্ণ ফ্রি করে দিয়েছিলাম। এমনকি কমপিউটারের সাহায্য চেয়েছে আনবিক শক্তি কমিশনও। কারণ তাদের এতো বড় মেশিন ছিল না। এ ছাড়া বিদ্যুৎ উন্নয়ণ বোর্ড, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড, ইউএস এইডসহ সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদের কমপিউটার ব্যবহার করতো।

এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাতে হাত রেখে আমরা নব প্রযুক্তির সন্ধানে এগিয়েছি সম্মুখে। আমাদের চলার পথে পথিক হতে চেয়ে আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী। তিনি নিজেই তাঁর প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা কমপিউটারায়ন ব্যবস্থা করতে চাইলেন। অতঃপর আমি তাঁকে এ ব্যাপারে সর্বোত সহযোগিতার আশ্বাস দিলাম। বুয়েট থেকে প্রশিক্ষকদল দিয়ে কমপিউটার সিস্টেম ডিজাইন থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বিল্ডিং-এর পরিকল্পনা এবং নকশা করে দিয়েছিলাম। তাই বলা যেতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রজের ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা কোবল, ফোরট্রান ইত্যাদির ওপরেও তখনই প্রশিক্ষণ দিয়েছি, যাতে নতুন নতুন কমপিউটার এনে তাতে কাজ করতে অসুবিধা না হয়। এর কিছুদিন পরেই BUET এ শুরু হয় "কমপিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনীয়ারিং" বিভাগ। কমপিউটার আসাতে দেশে শুধু আশার জোয়ারই বয়ে যায়নি, বিপরীতমুখী স্রোতেও আমরা ভেসেছি। যেমন দেখা গেল চালানোর জন্য সঠিক লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অথবা যাদের পাওয়া যাচ্ছে তারাও দ্বিধান্বীত। অনেকের ভয় ছিল কমপিউটার নামক দানব এসে হয়তো চাকুরীর ক্ষেত্রে একচ্ছত্র দানবীয় আধিপত্য বিস্তার করবে। যেমন টাইপিস্টের কাজ কমপিউটার করলে বেচারা টাইপিস্টের কি গতি হবে। আমরা নানাভাবে বুঝাতে চেয়েছি যে কমপিউটার করবে শুধু আমাদের অসাধ্য ও অসম্পূর্ণ কাজ। আমরা যেখানে সক্রিয় সেখানে কমপিউটার থাকবে নিস্ক্রিয়। তথাপি দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ছিলই। খোদ আমেরিকাতেও কমপিউটার ভীতি ছিল। আমেরিকায় যখন প্রথম কমপিউটার আসে তখন চাকুরেরা বিদ্বেষবশতঃ রাতে যেয়ে যন্ত্রটি ভেঙ্গে এসেছে। আরো ভয় ছিল কমপিউটারে প্রশিক্ষণ নিয়ে মেধাবী ছেলেরা মরীচিকার মোহে সুদূর বিদেশে পাড়ি দিয়ে আর ফিরে আসবে না। তবে নিজেদের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সান্তনা দিয়েছি এই বলে যে আমরা তো মাটির টানে ফিরে এসেছি ওরাও নিশ্চয়ই কেউ কেউ আসবে।

এখন তো পানি সম্পদ প্রকৌশল, বন্যা নিয়ন্ত্রণ রিসার্চেও কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে। কমপিউটারের সুদীর্ঘ সাফল্য গাঁথা গাইলেও, কত চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, কত প্রতিকূলতার বেড়া ডিঙ্গিয়ে কমপিউটার আমাদের সোনার স্পর্শ দিয়েছে, তা জানা দরকার। কমপিউটার বিদেশ থেকে দেশের মাটিতে পা দেয়ার আগে বিমানযোগে আসে নাকি সমুদ্রপথে এসে বন্দরে পড়ে থাকে তা দেখতে হতো। এত ভারী মেশিন আনতে নানা সমস্যা হতো। বর্তমানে অবশ্য কমপিউটারের উন্নতির সাথে সাথে মিনিকমপিউটার আনতে অনেক কম কষ্ট। তারপর শুল্ক দফতরের কটক পথ পাড়ি দিতে বেশ বেগ পেতে হতো। যারা এ মেশিন বহন করে নিয়ে আসে তাদেরও এব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যন্ত্রাংশের যেন কোন ক্ষতি না হয় সেটা দেখতে হতো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ ছাড়া কমপিউটার কাজ করতে পারতো না — এটাও সংরক্ষণের পূর্বশর্ত। অনেক কমপিউটার আনার পরে কর্তৃপক্ষের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অকেজো হয়ে গেছে। তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণেরও ব্যাপার ছিল। অনেক রুমে পানি ঢুকেও এই মূল্যবান জিনিষের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

কমপিউটারায়নের গুরুত্বপূর্ণ দিক ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারে আমরা চেয়েছিলাম টেলিফোনের লাইনের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রির মতো সিস্টেম করতে। আমি যখন ১৯৬৫ সালে সিগিকেটে ছিলাম তখন অক্সফোর্ডে ডাটা পাঠাতাম টেলিফোন লাইনের মারফত। এভাবে যোগাযোগ করা যায় এবং প্রোগ্রাম ও পাঠানো যায়। ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারে বাজার যাচাই করা উচিৎ। আমরা তথ্য অনুসন্ধান কমিটি পাঠাবার চেষ্টা করেছিলাম কয়েক বছর আগেই। কিন্তু তা হয়নি। বিশেষ করে হংকং, শ্রীলংকা, দক্ষিণ কোরিয়া, মালেশিয়া ছাড়াও অন্যান্য দেশ কিভাবে বাজার সৃষ্টি করেছে সেটার জন্য। এ কাজটি যদি সরকারী পার্যায়ে করা হয় তবে খরচ বেশী পড়বে অর্থাৎ খরচ যা হয় তার চেয়ে বেশী দেখাবে। তাই একাজটা বেসরকারী ভাবেই করা উচিৎ।

বিশেষ করে যে কথা বলছিলাম বিদেশে তথ্য অনুসন্ধান কমিটি পাঠিয়ে সে সব দেশ থেকে পরামর্শ কি পাওয়া যায় তা জানতে হবে।

তারপরে আমরা কমপিউটারের সঠিক পরিসংখ্যানের জন্য অনেক বক্তৃতা, ভাষ্য দিয়েছি। কোথায়, কবে কোন সিরিজের কত কমপিউটার এলো এগুলোর রেকর্ড থাকা দরকার বলে আমরা মনে করছি।

অপরদিকে আমাদের অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল বাংলাদেশ "কমপিউটার সোসাইটি"। এখান থেকে আমরা সদস্য পদ দেই। কোর্সের মেয়াদের ভিত্তিতে বা প্রশিক্ষণ অনুযায়ী বর্তমানে দেশের বিভিন্ন আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা কতটুকু সময় কমপিউটার ব্যবহার করেছে সেটার ওপর মান সম্মত করা যায়। এরাই পরে সোসাইটির মেম্বারশীপ পেতে পারে। কমপিউটার সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা সরকারের কাছে একটি খসড়া বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। সেখানে আমরা আলাদা করে কমপিউটার ব্যক্তিত্ব, কমপিউটার প্রকৌশলী, কমপিউটার সফটওয়্যার, কমপিউটার প্রোগ্রামার, কমপিউটার সিস্টেম এনালিস্ট—এদের কি বেতন স্কেল হওয়া উচিত তা ঠিক করে দিয়েছিলাম। আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী সদাশয় সরকার একটি বাজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমেই তা দিয়েছিলেন কিন্তু বিভিন্ন সংস্থাতে যারা কাজ করছে তারা এ স্কেল পায়নি।

আমরা আশা করবো আমাদের প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো প্রবর্তন করে সোসাইটির এগিয়ে যাওয়ার পথে যত বাধা বিঘ্ন আসবে সবকিছু দূরে সরিয়ে সহযোগিতায় পরম আশ্বাসের হাত বাড়াবে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল এবং সদাশয় সরকার।

আন্দোলনের মত করে 'কমপিউটার জগৎ', যখন বলে যে "জনগনের হাতে কমপিউটার চাই" তখন সত্যিই নিজেকে সাহসী ও ভাগ্যবান প্রজন্মের মানুষ ভাবতে ভাল লাগে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যমাত্রার বীজ আজ আন্দোলনের মাধ্যমে পত্র-পত্রিকায় রোপিত হলেই না আমরা সাফল্যের স্বাদ দিতে পারবো পরবর্তী বংশধরদের।

বর্তমানে দ্রুত উন্নয়ন-কামী রাষ্ট্রে বিভিন্ন সংস্থা নানাভাবে কমপিউটারে কাজকর্ম করে দ্রুত উন্নতির চরম শিখরে আরোহনে পরিবৃত। যেমন - ICTVTR-এ আমি আসার পর থেকেই দেখছি যে এখানে কমপিউটারে প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের পলিটেকনিক থেকে লোক আনা হচ্ছে। কারণ, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখা যায় যে প্রকৌশলীর সংখ্যা প্রচুর কিন্তু টেকনিক্যাল কাজে পারদর্শী সাহায্যকারী পাওয়া যায় না। কিংবা পাওয়া গেলেও তাদের প্রশিক্ষণ তেমন উন্নত নয়। এসব ক্ষেত্রে পলিটেকনিকে প্রত্যেকটা বিভাগে কমপিউটার দেয়া অত্যাবশক যেন কমপিউটারে পারদর্শী কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীর জন্ম হয়। এছাড়াও উচ্চতর ডিপ্লেমা প্রকৌশলেও আমরা কমপিউটার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছি। এখানে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের উপর শিক্ষা দেয়া হয়। বিভিন্ন সংস্থা নানাভাবে কমপিউটার শিক্ষায় জনগণকে শিক্ষিত করায় নিয়োজিত। তবে দেখা দরকার যে, সেটা কতটা স্ট্যাণ্ডার্ড। অফিস, আদালত সর্বত্র কমপিউটারের চাহিদা বেড়েই যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক, জনতা, সোনালী অন্যান্য ব্যাংকে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে কমপিউটার অতীব আপনজনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। রেলওয়ে, পিডিবি, গ্যাসা ছাড়া অন্যান্য সরকারী বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানে শুধু হিসাব নিকাষে নয়, বিস্তৃত আঙ্গিকে কমপিউটারের সুফল ভোগ করা উচিত। সাভারে আনবিক শক্তি কেন্দ্রের অব্যবহৃত বিশাল কমপিউটারটি পড়ে আছে। বি.সি.এস সহ অনান্য অফিসারদের জন্য এটা একটা বড় ধরনের প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

আমি বর্তমানকালের প্রেক্ষিতে মোটামুটি সর্বত্র কমপিউটারায়ন করার ব্যাপারে কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে চাই। যেমন-

(১) অফিসের শোভা বর্ধনের জন্য কমপিউটার এনে লাভ নেই। কেরানী থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত সবাই যেন সমান তালে কমপিউটারের সুফল ভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থা কঠোরভাবে করা উচিত। প্রথমে বিভাগওয়ারী ও পরে জেলাভিত্তিক ও শেষে উপজেলা পর্যায়ে কমপিউটারের সুফল পৌছানো দরকার।

(২) ক্লাস সেভেন থেকেই পড়ালেখার কাজে কমপিউটার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হোক।

(৩) কমপিউটারে উচ্চ প্রশিক্ষণ নেয়ার পর সরকারী, বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে মেধার মূল্যায়ন করতে হবে, যেন বিদেশের মরিচীকার পিছনে আমরা না ছুটি।

(৪) বিদেশে বাবারা আজ ছেলের কাছ থেকে কমপিউটার শিখছে। আমাদের দেশেও গণশিক্ষার মতো ঘরে ঘরে কমপিউটার শেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হোক।

(৫) দিনরাত ২৪ ঘন্টা কমপিউটার চালু রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। ভাগে ভাগে এতে কাজ করা যেতে পারে এবং এতে দ্রুত কমপিউটারায়ন হবে।

(৬) আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা ব্যক্তিগতভাবে কোন বিভাগের উপর কমপিউটারের দায়িত্ব না চাপিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের উপর দায়িত্ব ভাগ করে দিতে পারি। এতে চাপ কম পড়বে।

(৭) কমপিউটার যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আমদানী করে দেশে সংযোজক শিল্প গড়ে তোলার জন্য দেশে দক্ষ লোকাল-আব্যশক। এছাড়া যেসব যন্ত্রাংশে দেশে তৈরী করা যায় সেসব যেন বিদেশ থেকে আনা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের দেশে বর্তমানে বিদেশের অর্ডার অনুযায়ী কিছু কিছু কপিউটার তৈরি হচ্ছে যেগুলো সরাসরি বিদেশ চলে যায়। আমরা এ যন্ত্রগুলি দেশে সংযোজন করতে পারি আমাদের দেশের ব্যবহারের জন্য। কারণ সংযোজন থেকেই বিভিন্ন প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়।

(৮) ৮৩ সলে "National Commitee for National Development" শীর্ষক সেমিনারে সরকারকে জাতীয় কমিটি করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সরকার আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দিলেও আশা পূরণ হয়নি। পরে দেখা গেল জাতীয় কমপিউটার কমিটি হলো কিন্তু তা অধিক regulative. আমরা সুপারিশ করেছি এটাকে নব পর্যায়ে আধুনিকায়ন করার জন্য ঢেলে সাজাতে।

(৯) কমপিউটারের দ্রুত প্রসারতার জন্য বিভিন্ন মেলা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে হবে। দেশের ব্যাপক অবকাঠামোর উন্নয়নে রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকায় কমপিউটার সম্পর্কিত আরো বিস্তৃত কর্মসূচী নিতে হবে।

আমি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জনগনের হাতে কমপিউটারের আলোক বর্তিকা পৌছে দেয়ার জন্য মাসিক "কমপিউটার জগৎ"কে সুস্বাগত জানাচ্ছি। আন্দোলনের মত করে 'কমপিউটার জগৎ', যখন বলে যে "জনগনের হাতে কমপিউটার চাই" তখন সত্যিই নিজেকে সাহসী ও ভাগ্যবান প্রজন্মের মানুষ ভাবতে ভাল লাগে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যমাত্রার বীজ আজ আন্দোলনের মাধ্যমে পত্র-পত্রিকায়রোপিত হলেই না আমরা সাফল্যের স্বাদ দিতে পারবো পরবর্তী বংশধরদের। আমি তাই সর্বাঙ্গীনভাবে 'কমপিউটার জগৎ'-এর সাফল্য কামনা করে ধন্যবাদ জানাই।

(১০) বুয়েট কমপিউটার সেন্টার থেকে একটা পাইলট প্রজেক্ট নিয়ে ঢাকা ও আশেপাশের কিছু কিছু স্কুলে মাইক্রো কমপিউটার ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। ভারতে এই পাইলট প্রজেক্ট বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া আলাদা শিক্ষক প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা ও করা দরকার।

(১১) বিভিন্ন সংস্থা নানাভাবে কমপিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আমর মনে হয় সর্বপ্রথম দেখা উচিত যে এগুলো কতখানি মানসম্মত। শুধু সার্টিফিকেট দিলেই হবে না। কার প্রশিক্ষণ কতখানি স্ট্যাণ্ডার্ড সেটা প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

(১২) কমপিউটার সোসাইটির সদস্যরা বর্তমানে নান জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। কিন্তু যে কোন কাজে যেমন একতাই বল, তেমনি আমাদের একত্র হয়ে প্রত্যেক মাসে সিটিং ও মিটিং হওয়া অত্যাবশক।

(১৩) সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দেশে প্রচুর কমপিউটার আনতে হবে। বেসরকারী পর্যায়ে কমপিউটার আনার ব্যাপারে ব্যাংক ঋণ দিতে পারে সহজ কিস্তিতে, তাহলে অনেকেই কমপিউটার দেশে আনাতে আগ্রেহী হবে। অন্যভাবে সরকার কর কমিয়েও সুবিধা করে দিতে পারে। ♦

অনুলিখনঃ রেহানা আকতার লাকী